সাক্ষাৎকার ▌ফারহানা সুলতানা

গ্রামে বসেও জীবন বদলানো সম্ভব

সাক্ষাৎকার গ্রহণ অজয় দাশগুপ্ত

যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকুস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারহানা সুলতানা। ঢাকায় এসেছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিতে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্স শেষে পিএইচডি করেছেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষণায় আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি-সমাজের সম্পর্ক, রাজনৈতিক প্রতিবেশ, উন্নয়ন ভূগোল, ফেমিনিস্ট ভূগোল, পানি ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি। আর সব কাজেই বাংলাদেশ ফোকাসে রাখছেন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগদা ইউনিয়নের মেয়ে ফারহানা সুলতানা।

সমকাল : এক সময়ে আপনার গবেষণার বিষয় ছিল চিংড়ি চাষের এলাকা নিয়ে...।

ফারহানা : তখনও পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। চিংড়ি চাষ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখি, এতে সচ্ছলতা যেমন আসে, তেমনি অনেক সমস্যা। উদ্যোক্তারা গরিবদের জমি কেড়ে নেয়। অত্যাচারের ঘটনা অনেক। চিংড়ির ঘেরের জন্য শিশুরা দিনভর মাছের পোনা ধরতে পানিতে কাটায়। এর ফলে রোগব্যাধির প্রকোপ ঘটে। চিংড়ি চাষের জমির লোনা পানি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে ফেলে। গরিবরা খাবার পানির কষ্টে ভোগে। মহিলাদের কষ্ট সবচেয়ে বেশি। পানির কলসি নিয়ে তাদের ছুটতে হয় দূরের গ্রামে। এটা যেমন পরিবেশের সমস্যা, তেমনি জেন্ডার ইস্যু। আর জেন্ডার বলতে কিন্তু নারী-পুরুষ সবাইকেই বোঝায়। নারী কোনো সমস্যায় পড়লে পুরুষরাও তার শিকার হয়।

সমকাল : ইউএনডিপির সঙ্গেও আপনি কাজ করেছেন...।

ফারহানা : তাদের ২৬টি প্রকল্প ছিল ২২টি সংগঠনের সঙ্গে। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বা এনজিও ছিল। আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে কাজ করেছি। ৪ উপজেলার ১৮টি গ্রামে গবেষণার জন্য কাজ করি। অনেক পরিবারের সঙ্গে মিশেছি। আর্সেনিক কেবল স্বাস্থ্যগত নয়, সামাজিক সমস্যাও। আবার ধনী ও দরিদ্র পরিবারের জন্য এ সমস্যা ভিন্ন ধরনের। ধনীরা বাড়িতে নিজেদের অর্থে ডিপটিউবওয়েল বসাতে পারে। কিংবা তা ম্যানেজ করতে পারে সরকার কিংবা কোনো সংস্থার মাধ্যমে। কিন্তু দরিদ্রদের অগভীর নলকূপের ওপর নির্ভর করতে হয়। টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করে আর্সেনিকমুক্ত হলে সবুজ রঙ এবং দূষণ থাকলে লাল রঙের চিহ্ন দেওয়া হতে থাকে একের পর এক বাড়িতে। সে সময়ে বরিশালের তুলনায় যশোর এলাকায় বেশি দূষণ পাওয়া গেছে।

সমকাল : এখন কিন্তু আর্সেনিক ফোকাসে নেই। এ সমস্যা কি কমেছে?

ফারহানা : এবারে ঢাকায় অবস্থানকালে আর্সেনিক নিয়ে কম আলোচনা শুনেছি। পত্রিকায়ও কম দেখেছি। তবে সমস্যা কমেছে, এটা মনে হয় না। ১৯৯৮ সালে এ বিষয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে এর নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সর্বত্রই অনেক শঙ্কার কথা বলা হচ্ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান এটা কোনোভাবেই বলছে না যে, বাংলাদেশ এ সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছে। তবে ফোকাসে কিছুটা কম, তাতে সন্দেহ নেই। এখন গণমাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এতে আমার আপত্তি নেই। তবে আর্সেনিকের মতো ইস্যু যেন কখনোই আমরা বিস্মৃত না হই।

সমকাল : আর্সেনিক সমস্যা বিষয়ে জনসচেতনতা বেড়েছে বলেই কি এমনটি হচ্ছে?

ফারহানা : সচেতনতা অবশ্যই বেড়েছে। একই সঙ্গে আর্সেনিকমুক্ত পানির প্রাপ্যতাও বেড়েছে। গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে বেশি বেশি করে। ফিল্টারের পানি মিলছে অনেক পরিবারে। পানিকে আর্সেনিক দূষণ থেকে মুক্ত করার প্রযুক্তি সুলভ হয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলোও তা সংগ্রহ করতে পারে।

সমকাল : বাংলাদেশের অনেক ইস্যু দাতা সংস্থার কারণে বেশি গুরুত্ব পায়, এমন কি মনে হয় না?

ফারহানা : এটা হতে পারে যে তারা যে খাতে যখন অর্থ বরাদ্দ দেয় কিংবা কারিগরি সহায়তা প্রদান করে, তার প্রতি ঝোঁক দেখা দেয়। এখন তাদের কাছে জলবায়ু পরিবর্তন প্রাধান্য পাচ্ছে। গণমাধ্যমও বিষয়টিকে সে কারণে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে এটাও ঠিক যে, টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক রয়েছে শুনলেই মানুষ আর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে না। এর কারণ একদিকে সচেতনতা বেড়েছে, পাশাপাশি রয়েছে খাবার পানির বিকল্প উৎস। আর্সেনিকের কারণে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে আর একঘরে করে রাখা হয় না। এর পেছনে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের অবদান রয়েছে।

সমকাল : যেসব গ্রামে আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন, সেখানে বিশেষ কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ে?

ফারহানা : অনেক ঘটনা বলা যায়। তবে সামান্য একটু লাল রঙ যে কী অশুভ বার্তা নিয়ে আসে সেটা বলতে চাই। যাদের বাড়ির টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক থাকার কারণে লাল রঙ দেওয়া থাকত, সেখানে অতিথিরা পানি খেতে চাইত না। এ লাল রঙ ছিল সামাজিকভাবে একঘরে না হলেও হেয় হওয়ার চিহ্ন।

সমকাল : বাংলাদেশের নানা ইস্যু নিয়ে আপনার কাজ। প্রতি বছর দেশে আসছেন। এখানে কী পরিবর্তন নজরে আসছে?

ফারহানা : মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন অবশ্যই আসছে। অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটছে। পুরুষশাসিত সমাজে আমরা বসবাস করছি। মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ অনেক পরিবারে। বারবার জবাবদিহি চাওয়া হয়। পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা গ্রাম ও শহরের সর্বত্র। কিন্তু তারপরও বলব, নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে অনেক পরিবার ভাগ্য বদলাচ্ছে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বাড়ছে। শিক্ষার প্রসারের কারণে পরিবারের আকার ছোট রাখার আগ্রহ বাড়ছে। এক সময়ে ধারণা ছিল, পরিবারে সন্তান সংখ্যা যত বেশি হবে আয় করার লোক তত বাড়বে। এখন সবাই পরিবার ছোট রাখতে চায়।

সমকাল : ঢাকায় কিংবা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় লক্ষণীয় কী পরিবর্তন দেখছেন?

ফারহানা : ঢাকায় এখন বহুতল ভবনের ছড়াছড়ি। ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন হাজার হাজার মানুষ। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এ ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য। যানজটের কথা সবাই জানেন। এখানে নাগরিক পরিকল্পনার বড় অভাব। বস্তি নিয়ে আমি কাজ করছি অনেক বছর। পানিও আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তিতে এ সমস্যা প্রকট। শহরমুখী হচ্ছে মানুষ। এর নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। শহরে উপার্জনের সুযোগ বেশি। কিন্তু প্রতি বছর দেশে এসে এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে গ্রামে বসেও ভাগ্য বদলানো সম্ভব। এ জন্য অবশ্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামেও মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বসবাস করা যায়, এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

সমকাল : বস্তিতে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন?

ফারহানা : গুলশান ও বনানী অভিজাত এলাকা হিসেবে স্বীকৃত। এর ভেতরেই রয়েছে কড়াইল বস্তি। এখানে কত লোক বাস করে, তার উত্তর সহজে কেউ দিতে পারবে না। কারও মতে ১০ হাজার, কেউবা বলেন এক লাখও হতে পারে। এখানে যারা বসবাস করে তারা সবাই যে হতদরিদ্র সেটা বলা যাবে না। কেউ কেউ বাধ্য হয়েও বস্তিতে থাকছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ ও পানির সমস্যা সবার ক্ষেত্রে সমান প্রকট। বস্তিতে কোনো ব্যক্তিগত হোল্ডিং নম্বর থাকে না। এ কারণে পানির লাইন পাওয়া কঠিন। ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এখানে পানির পাম্প স্থাপন করছেন। বস্তিবাসীরা পানির বিল দিতে চায়। তাদের হয়ে দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র নামের একটি প্রতিষ্ঠান দেনদরবার করছে, কোল্যাটারাল দিচ্ছে। রাজধানীতে ৩০ শতাংশ লোক বস্তিতে বসবাস করছে, এমন একটি পরিসংখ্যান নানাভাবে শুনেছি। এরা দরিদ্র ও স্থায়ী ঠিকানাবিহীন বলে তাদের আপনি পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারেন না।

সমকাল : তাদের পানির ব্যবস্থা কীভাবে হয়?

ফারহানা : তারা পানি কিনে আনে এবং এর পরিমাণ হয়ে থাকে সামান্য। তবে এটাও কিন্তু কিনে আনে ওয়াসার লাইন থেকে। এ কাজে যুক্তরা এ সুযোগে কিছু অর্থ কামিয়ে নেয়। তাতে ওয়াসার লাভ নেই। তাদের বরং লাভ বস্তিতে পানির সংযোগ দিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে নিয়মিত বিল আদায় করতে পারলে। আমার সঙ্গে যেসব বস্তিবাসীর যোগাযোগ হয় তাদের বেশিরভাগ ওয়াসাকে ন্যায্য বিল দিয়েই পানির সংযোগ নিতে আগ্রহী। তবে পানির রেট নিয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। যারা ঘরের কাজে অঢেল পানি ব্যবহার করে এবং গাড়ি ধোয়ামোছা ও বাড়ির লন সুন্দর রাখার জন্যও এ পানি ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে বস্তিবাসীকে এক করে দেখা চলে না। পানির সমস্যার কারণে বস্তিতে নানা রকম রোগব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয়। ঘরে ঘরে শিশুদের ডায়রিয়া ও চর্মরোগ। বড়রাও তাতে আক্রান্ত হয়। এ ধরনের রোগব্যাধির কারণে মহিলারা বিশেষ সমস্যায় পড়ে। তারা অসুস্থ সন্তানকে রেখে কাজে যেতে পারে না। এর ফলে পারিবারিক আয় কমে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, নতুন করে রোগব্যাধির প্রকোপ। তবে শহরের লোকদের আপনি জোর করে গ্রামে পাঠাতে পারবেন না। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অবশ্যই তাদের অনেকে গ্রামে ফিরে যেতে চাইবে। আমি আগেই বলেছি, গ্রামে এখন ভালোভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব। তাদের একটু সুযোগ করে দিন, দেখবেন প্রতিদান মিলবে। তবে এ জন্য অপরিহার্য শর্তগুলো সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

সমকাল : সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য ধন্যবাদ।

ফারহানা : সমকালের পাঠকদের জন্য আমার অশেষ শুভেচ্ছা।